আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির-রাজীম

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সর্বশেষ অপার্থিব

মোহাম্মদ তোয়াহা আকবর

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

কথামালার জন্মকথা

স্রষ্টা আছেন। তিনি একক। এবং অসৃষ্ট। 'উল্টো নির্ণয়' বইটা ছিল এই তিন ব্যাপারে যৌক্তিক প্রমাণগুলো সহজ ভাষায় মানুষকে জানানোর পাশাপাশি, স্রষ্টার সাথে নিজেদের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে সাহায্য করার ক্ষুদ্র একটা চেষ্টা।

সেই স্রষ্টা মানুষকে এমনি এমনি সৃষ্টি করেননি। তাই সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্যটা তিনি মানুষকে জানিয়ে দেন। পথ দেখান। সত্যের পথ। সত্যের এই পবিত্র পথে হাঁটা কতটা সহজ, সেটা হাতে-কলমে দেখিয়ে দিতেও তিনি ভুলেন না। তাই বার্তাবাহক আর শিক্ষক হিসেব বেছে নেন মানুষের মাঝ থেকেই উত্তম কাউকে। 'কে উনি?' বইটা ছিল স্রষ্টার নির্বাচিত সর্বশেষ বার্তাবাহক আর শিক্ষকের সত্য হবার প্রমাণ নিয়ে সহজ ভাষায় হাজির হবার বিনীত প্রয়াস।

বাকি ছিল স্রষ্টার প্রেরিত বাণীর সত্যতা আর প্রমাণ নিয়ে লেখা।

আচ্ছা, আমি কীভাবে বুঝব যে, এই বাণী সেই সত্য স্রষ্টার পক্ষ থেকেই আগত? অবিশ্বাসীরা যে একের পর এক প্রশ্নবাণে জর্জরিত করছে আমাদেরকে! অগণিত এই প্রশ্নবৃষ্টির প্রতিটার জবাব দেয়ার সময় কি আছে? আর সময় থাকলেও অসীম সব বানোয়াট আর মিথ্যা অভিযোগের উত্তর দিতে কি ব্যস্ত থাকা উচিত? সময়ের কি কোনো মূল্যই নেই? এমন কোনো সত্যের ছাতা কি নেই, যা থাকলে প্রশ্নের বৃষ্টিতে গা ভিজে যাওয়ার আর কোনো আশঙ্কাই থাকবে না?

এমন একটা সাধারণ ছাতার নামই 'সর্বশেষ অপার্থিব', যেটা এখন বই হিসেবে পড়া হচ্ছে।

সত্য এমনই। সাধারণ। সুন্দর।

কে না জানে যে, দুই আর তিন যোগ করলে পাঁচ হয়! এই সহজ গণিতটা বুঝে গেলেই ব্যস! এরপরে কেউ এসে যতই ফালতু দাবি করুক যে, দুই আর তিনের যোগফল হয় ঊনপঞ্চাশ, কিংবা চারশ বিশ, আমরা ঠিকই সেই সব বোকা বোকা দাবিগুলো

শুনে কাতুকুতু অনুভব করে ঠা-ঠা করে হেসে উড়িয়ে দিতে পারব। সাথে এক বুক ভালোবাসা, আর মায়া নিয়ে, সাথে এক গাল হেসে বোকা-সোকা মানুষটাকে সহজ সত্যটা বুঝিয়ে দিয়ে কাছে টেনে নিতে পারব ইনশাআল্লাহ।

সত্য যে এমনই!

সাবলীল। সহজ। স্বাচ্ছন্দ্যময়। স্বচ্ছ।

আর পবিত্র।

কথার সুতো

আমাদের মিছিলে 'আমি' ১২

আলোর রেখা ২০

শুনি কার বাণী? ২২

সুন্দরের পাঠ অসুর থেকে? ২৪

কুম্ভীলকবৃত্তি? ২৭

বিদ্বানের দ্বারে পরিত্যাজ্য দুর্জন? ৩১

একলা চলো রে? ৪৪

ক. কুরআনে ব্যক্তিগত তথ্য ও আলোচনা ৪৫

খ. সংশোধনকারী কুরআন ৪৬

বৈধের নিষিদ্ধকরণ ৪৭

খাওলা বিনতু সালাবার ﵂ ঘটনা ৪৭

যুদ্ধবন্দিদের পরিণাম ৪৯

ভণ্ডের অনুমতি প্রাপ্তি ৫১

অন্ধ সাহাবি ৫৩

গ. ভবিষ্যদ্বাণী : কেন এই অকারণ ঝুঁকি? ৫৬

রোমানদের জয়লাভ ৫৬

আসন্ন বিজয় ৫৯

আবু লাহাবের জন্য পরোয়ানা ৬৪

ঘ. অপেক্ষার অগ্নিপরীক্ষা ৬৭

দ্বিতীয় ওহি ৬৭

অপবাদের দহন ৬৮
প্রশ্নবাণ ৭০
ঙ. মানব ও দানবকে চ্যালেঞ্জের মহা ঝুঁকি কেন? ৭২
চ. ভাষার ধাঁচে আকাশ-পাতাল ৯৯

সংরক্ষণের গল্প ১০৭

শেষ হইয়াও তাই, হইলো না শেষ ১১০

এক টুকরো অপার্থিব বিস্ময় ১১১

আরও কিছু বিস্ময় ১৩৭
১। আলোর ওপরে আলো ১৩৯
২। মহাবিপদ ১৩৯
৩। শ্রেষ্ঠ গল্প ১৪০

বাক্সে বাক্সে বন্দি বাক্স ১৪১

কে বানাইল রে? ১৪৬
সূয্যিমামা ১৪৬
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা ১৫০
লোহার দেহ ১৫২
ও পোড়া চোখ, সমুদ্রে যাও ১৫৩
আমি সৃষ্টি, তাই স্রষ্টায় ভালোবাসি ১৫৭
মিথ্যা বলেছ বলিয়া তোমায়... ..... ১৫৯
যাতনা কাহারে বলে? ১৬১

শেষের কবিতা ১৬৩

ভাবুন! নিজেকেই খুঁজে পাবেন ১৬৫

ফাঁকিবাজির দাসত্ব ১৬৮

শুদ্ধ আধ্যাত্মিকতা ১৭১

ধন্য কারা? ১৭২

শত চিরকুট ১৭৩

স্রষ্টার ব্যাপারে জ্ঞান ২১৪

স্পেস-টাইম আর আপনি ২১৬

অরুণের সিদ্ধান্ত এবং আমাদের জ্ঞানার্জন ২১৮

অসাধারণ ফলাফল! ২২২

গ্রন্থকথা ২২৫

সহায়ক তথ্যসূত্র ২২৯

Links ২২৯

References ২২৯

আমাদের মিছিলে 'আমি'

আপনার সাথে আমার অনেক অনেক কথা বলার আছে। কিন্তু আপনি আমার কথা কেন শুনবেন? আপনি তো আমাকে চিনেনই না, তা-ই না? আপনার জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটা যাত্রায় আমি সাহায্য করতে চাচ্ছি। কেন চাচ্ছি, কে আমি, সেটা না জেনে আমার কথা তো আপনি সেভাবে বুঝতে চাইবেন না। আর এটাই স্বাভাবিক। এই কারণেই আমি নিজের পরিচয় দিয়ে এই লেখাটা শুরু করার একটা তাগিদ অনুভব করছি।

আমি কে? কী আমার পরিচয়? এই আলোচনা আসলেই মানুষ নিজের নাম, বাড়ির ঠিকানা, বংশ পরিচয়, কী কাজ করি, ব্যাংকে কত টাকা আছে, বাড়ি-গাড়ি আছে কি না ইত্যাদি সব বাহ্যিক আর বস্তুবাদী বর্ণনা করা শুরু করে দেয়। আমার মতো আপনিও ভালোভাবেই জানেন, এটা আমাদের আসল পরিচয়ের কিছুই বহন করে না। আমি-আপনি দুজনেই জানি, আমাদের সত্যিকারের পরিচয় হচ্ছে আমাদের শারীরিক আর বস্তুবাদী পরিচয়কে অতিক্রম করে আরও বেশি কিছু, অন্য কিছু, অপার্থিব এক পরিচয়। আত্মার যে যাত্রা, সেই যাত্রার পরিচয়। আমি আমার নিজের সেই যাত্রার একটা ক্ষুদ্র অংশই আপনাকে জানাব আজ।

বুয়েট ভর্তি পরীক্ষার রেজাল্টে যখন দেখেছিলাম আমি বুয়েটে পড়তে পারব না, তখন আব্বু-আম্মুর চেয়ে আমার মন খারাপের আকাশটাই বেশি কালো ছিল। আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের আলোচনায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছিল দুনিয়ার সবচাইতে ক্ষ্যাত ইউনিভার্সিটি। হ্যারি পটারের হোগওয়ার্টস এক্সপ্রেসের মতো একটা রেলগাড়ি ছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আর ভালো কিছু আছে কি না, তা ফ্রেন্ড সার্কেলের কারোরই জানা ছিল না। আমার সবচেয়ে কাছের কিছু বন্ধু না পারতে এখান থেকে ভর্তি ফর্ম নিয়েছিল, বেশির ভাগ তো ফর্মই নেয়নি। কী অদ্ভুত!

পরে বুঝেছি, একটা ভার্সিটি কখনো ক্ষ্যাত হয় না, ক্ষ্যাত হয় সেখানকার মানুষগুলো, বুদ্ধিবৃত্তিক বন্ধ্যাত্বের কারণে। যা-ই হোক, নিজে ক্ষ্যাত আর গাধা বলেই কোথাও

চান্স পেলাম না, শুধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েই টিকলাম। আমার প্যাশন, স্কীল সব ছিল ফিজিক্যাল সায়েন্সে; ইচ্ছা, ভালোবাসা, প্রবৃত্তিও। যেহেতু গাধা, অতএব স্বাভাবিকভাবেই ফিজিক্যাল সায়েন্সেও পছন্দের কোনো সাব্জেক্টে চান্স পেলাম না। বায়োলজি ছিল দুই চোখের বিষ। 'লেডিসদের সাব্জেক্ট' বলে আজীবন ঘেন্না করেছি সাব্জেক্টটাকে, এতই অহংকারী ছিলাম আমি (আচ্ছা, এখনো কি নেই?)। সেইজন্যেই কি না জানি না, ভর্তি হতে হলো একেবারে বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেই। পৃথিবীর বুকে এটা কোনো কথা?

যা হোক, গেলাম ভার্সিটিতে। গিয়েই দেখা এক ফ্রেন্ডের সাথে। দুই বছর পর দেখা। এর মাঝে কোনো যোগাযোগ ছিল না। ভর্তি পরীক্ষায় সে আমার চাইতেও অনেক এগিয়ে একেবারে প্রথম দিকেই ছিল। ফলাফল, সে ইচ্ছে মতোন যেকোনো সাব্জেক্ট নিতে পারবে। কুশলাদির পর জিজ্ঞেস করলাম,

- 'কী রে? কোন সাব্জেক্ট নিবি?'

- 'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি।'

এইটা আবার কী সাব্জেক্ট? বিশ্বাস করুন, কোনো আইডিয়াই ছিল না সাব্জেক্টটা সম্পর্কে। আর দুই চোখের বিষ বায়োলজিই তো! একটা সাব্জেক্ট নিয়ে পড়লেই তো হয়। কী আছে আর জীবনে? সাথে সাথেই তাই, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজিতে ফাজলামি করেই ভর্তি হয়ে গেলাম। এমন কি জানতামও না এই সাব্জেক্টের ভেতরে আসলে কী পড়াবে না পড়াবে! কেন এই উদাসীনতা আর তীব্র অবহেলা?

কারণ, বুয়েটে টিকতে না পারায় এই নাস্তিক আমার ভেতরে 'জীবন তো শ্যাষ' টাইপের একটা ফ্যাতফ্যাতে অনুভূতির জন্ম নেয়। কেউ আমাকে কোনোদিনও অসাধারণভাবে বায়োলজি পড়ায়নি, তাই এটা ভালোও লাগত না, অনুভব করার তো প্রশ্নই আসে না। ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিজিক্স আর ম্যাথের উত্তেজনা ছেড়ে বায়োলজির মতোন বোগাস আর বোরিং একটা সাব্জেক্ট! ধ্যাত! বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম, মাইক্রোবায়োলজি আর বায়োকেমিস্ট্রিই চাকরির বাজারের হিসেবে সবচাইতে অসাধারণ সাব্জেক্ট, দুটোর মাঝে যেটা ইচ্ছে সেটা নিতে পারি, চয়েস আমার। কিন্তু কী আসে যায়? আমার লাইফ তো এমনিতেই শ্যাষ। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং দিয়েই না হয় লাইফটা ধ্বংস করে দিই। সেই বিষ-ই হাতে তুলে নিলাম।

ভার্সিটিতে যখন ভর্তি হই, তখন আমি বেশ গাঢ় লিকারের নাস্তিক। বেশি পড়াশুনা করে ফেলেছি ভাবলে যা হয় আর কী! চারপাশের ধার্মিক 'ধর্মান্ধদের' সাথে বেশ কথা হতো। ধর্ম নিয়ে কোনো পড়াশুনা না থাকায়, গভীর কোনো চিন্তা-ভাবনা না থাকায়

যুক্তিতে তারা কখনোই সুবিধে করতে পারত না। শেষে নিজের বিশ্বাস বাঁচাতে এই বিষয়ে আমার সাথে আর কথাই বলত না। ফলাফল, আমার দাঁত কেলানো অহংকারী বিজয়ীর হাসি। আরেকদল ছিল ধর্মমূর্খ। নিজেকে একটা নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসারী দাবি করে, অথচ সেই ধর্মের গ্রন্থ কোনোদিনও বুঝে পড়েনি, অনুসরণও করে না (একজন অমুসলিম যেমন কুরআন-সুন্নতের অনুসরণ করে না, ঠিক সেরকম), ভণ্ডামি করে, আর দিনশেষে দাবি করে, সে নাকি অবশ্যই স্বর্গে যাবে! এটা কেমন কথা? আমার পেছনে পেছনে 'ব্যাটা নাস্তিক মুরতাদ কোথাকার' বলে কমেন্ট করবে, অথচ সামনে এসে একটা কথা বলার সাহস পায় না।

এইসব কাপুরুষ আর অন্ধ দেখে দেখে ধর্মের প্রতি ঘেন্না আর নিজের ভেতরের অহমিকা আরও বেশি করে ধারালো হয়ে উঠেছিল দিনের পর দিন। সবার ভেতরে শুধু নাস্তিক-মুরতাদদের জন্যে বুকভরা ঘেন্নার পাহাড়, অথচ তাদের সাথে সুন্দর করে বুঝিয়ে কথা বলার উদারতা আর সৎসাহস, গভীর পড়াশোনা কিংবা আন্তরিকতা বেশির ভাগ মানুষেরই ছিল না, এখনো দেখি না। সবার একটাই লাইফ, শুধু নিজেকেই কেন্দ্রে রেখে সেই স্বার্থপর ধর্মান্ধ মানুষের পুরো জীবনটা ঘুরতে থাকে। অন্যের জ্ঞানহীনতা, পথভ্রষ্টতা আর পরিণতি ভেবে এদের কারও চোখে জল আসে না, গলায় খাবার আটকে যায় না, রাতের ঘুমের কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। মানুষ জাহান্নামে যাবে, আর সে যাবে জান্নাতে –এই ভাবনা তাকে কাঁদায় না; বরং এক বিদঘুটে আত্মতৃপ্তি তার মুখে ক্রুর আর তির্যক এক হাসির জন্ম দেয়। বাইরে আত্মতৃপ্তির ঢেকুরের জোরালো আওয়াজ শোনা যায়।

আমি এদেরকে নিয়মিত দেখি আর ভাবি, ভালোবাসা আর মায়া-মমতাহীন এই মানুষগুলোই ধার্মিক! এরাই ধর্ম বুঝে! এই মানুষগুলোই স্রষ্টার প্রিয়! রুক্ষ প্রাণের এই কর্কষ আর রূঢ় মানুষগুলোকেই স্রষ্টা স্বর্গে রাখবেন নিজের কাছে! কীভাবে সম্ভব! কোনো হিসেবই তো মেলে না।

অথচ যারা সত্যটা জানে না, চিনে না, তাদের কাছে ভালোবাসা আর মমতা নিয়ে পৌঁছানোর তাগিদটা বেশির ভাগ মুসলিমের মাঝেই আর নেই। থাকবেই বা কীভাবে? তারা নিজেরাই কি পরকালের দাউদাউ করে উঠা আগুনের ব্যাপারে নিশ্চিত? যদি সত্যিই নিশ্চিত হতো, তাহলে কীভাবে কুরআন-সুন্নতের নির্দেশনা অমান্য করেও তারা ঘুরতে পারে, আরেকজন অমুসলিম মানুষ পরকালে অনন্তকাল ধরে চরমতম শাস্তি পাবে জেনেও কীভাবে রাতে ঘুমাতে যেতে পারে? অথচ দুনিয়ার আগুনে কেউ পাঁচ মিনিটের জন্য পুড়তে থাকবে, এমন আশঙ্কাই তো আমার জীবনের সব ঘুম কেড়ে নেয়ার কথা, সেই মানুষটাকে বাঁচানোর জন্য জান-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করার কথা অবিরাম।

তা-ই না?

তাহলে অনন্তের আগুনের ক্ষেত্রে জেনে-বুঝেও কি একজন মানুষের পক্ষে নির্বিকার আর চুপচাপ থাকা সম্ভব? কখন সম্ভব? যখন সে আসলে ওই অনন্তের আগুনের অস্তিত্বের ব্যাপারে সত্যি সত্যিই জানে, বুঝে, বিশ্বাস করে, তখনো কি সম্ভব? গভীরভাবে ভাবার অনুরোধ রইল।

যা-ই হোক, ক্লাস চলছে ভার্সিটিতে। অন্ধ আমার চরম উগ্রতা আর অহংকারী পরিচয় আমার সতীর্থরা ইতিমধ্যেই হাড়ে হাড়ে জেনে গেছে। সবার সাথে বেশ ফাজলামো করতাম, হিহি হাহা করতাম সারাদিন, সবার সাথেই চুটিয়ে আড্ডা আর ঘুরাঘুরি হতো। বন্ধুত্বের জয়গান আর তীব্র টানে আমি তখন বিভোর। যেতে-আসতে শাটল ট্রেইনের কোণায় উদ্দাম গান গাওয়া, আর বন্ধুত্বের মহানন্দ! আহা! এই তো জীবন, আর কী চাই জীবনে? নাহ, কখনো মদ, গাঁজা ছোঁয়া হয়নি; ইভটিজিং করিনি লাইফে; কিন্তু এর বাইরের ষোলো আনা উগ্রতা আর অহংকার আমার চোখে-মুখে খেলা করত। (এখনো করে কি না কে জানে?)

আর পড়াশোনা? ভার্সিটির পড়াশোনা আর কী! ক্লাসে ঘুমাও (অন্তত ঝিমাও), আর যদি মানুষ হও তাহলে যাওয়ারও দরকার নেই, বাসাতেই ঘুমাও। তারপর নোট বানাও বা খোঁজো, এক্সামের আগে ধুমায়ে এক মাস পড়ো, আর মার্কস কোপাও। এখানে সত্যিই আর তেমন কিছু শেখা হয় না, চিন্তা-ভাবনার বিশ্লেষণধর্মী চর্চা-আলোচনা এখানে 'Nerd', 'Geek' জাতীয় শব্দের পাহাড়ে থ্যাঁতলা হয়ে নিরুৎসাহিত অবস্থায় পড়ে থাকে। সত্যিকারের জীবনবোধ আর জ্ঞানার্জনের বালাই এখানে আর নেই, তাই সত্য কোনো জ্ঞানের আলোয় কারও জীবনও আর বদলে যায় না।

অন্ধকার যে শুধু রয়েই যায় তা-ই নয়; বরং বাড়তে থাকে চক্রবৃদ্ধি হারে। ডিগ্রির সাথে সাথে অহংকারের ব্যাগটা ক্রমে ভারী হয়ে আসে।

নানা প্রকারের কৃত্রিম ট্যাগ আর মিথ্যে পরিচয়ের সাথে সাথে মানুষ নিজের নামের আগে 'ডক্টর' লাগাতে মরিয়া হয়, আর ভাবতে থাকে, এই শব্দটা যুক্ত হলেই বোধ হয় শুধু মানুষ হিসেবে 'জাতে' ওঠা যায়। একবার জাতে উঠে গেলেই 'ব্যস! কেল্লাফতে!' তখন 'ডক্টর তোয়াহা' না ডাকলেই আঁতে লেগে যায়, অস্ত্র তখন এতটাই দুর্বল আর সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। হাহাহা, বিশ্বাস করুন, এরকম সংকীর্ণ মনোভাবের মানুষদেরকেই আমরা মনে করি জাতির ভবিষ্যত, মেরুদণ্ড এবং ইত্যাদি।

কেবল ভালোভাবে পাশ করে, কিছু দক্ষতা গজিয়ে, পুঁজিবাদী সমাজের একটা রোবট-দাস হিসেবে পরিণত হয়ে, লোকসমাজের বাহবার পুজো-নৈবদ্যর ডালা সাজিয়ে, চেনা কোনো পথে ক্যারিয়ার গড়বার জন্যে জাস্ট কিছু তথ্য ঢুকাতে হয়

মাথায়, মাঝেমাঝে গবেষণার নামে চোখ বুজে রেখে হালকা একটু নাড়াচাড়া করে রেখে দিতে হয়, কিছু দক্ষতা অর্জন করতে হয়, কিন্তু তার সাথে নিজের আত্মার আর ভাবনার কোনো সম্পর্ক তৈরি হয় না। বদলায় না জীবনের দর্শন। আত্মিক জীবন তাই পড়ে থাকে শ্যাওলা জমা ডোবার মতো। স্রোতহীন। আলোহীন। ঘুটঘুটে অন্ধকার।

রেজাল্ট ভালো হলেই সমাজের চোখে তুমি খুব মেধাবী, আর খারাপ হলেই 'তোরে দিয়া কিচ্ছু অইত না রে' বলে সবার কী জোর স্লোগান! বিগত পনেরো বছরের মেধা, কষ্ট, অধ্যবসায় সব যেন ফালতু হয়ে যায় সমাজের চোখে ওই এক রেজাল্টের কাগজে, আর ভেঙে দেয় বেশির ভাগ শিক্ষার্থীকে। পুরো সমাজটা একজন মানুষের প্রতি এতটা অমানবিক আর জঘন্য আচরণ কীভাবে করতে পারে? ভাবলে এখনো সারা গা শিউরে ওঠে।

স্বাভাবিকভাবেই আমাকে নিয়েও আমার মধ্যবিত্ত বাবা-মায়ের অনেক স্বপ্ন ছিল। ছোটবেলা থেকে ভালো ছাত্রের তকমা গায়ে নিয়েও বুয়েটে না টেকা, ধর্মহীন জীবনযাপন এবং শেষে ইচ্ছে করে একটা অজানা সাব্জেক্টে ভর্তি হওয়া—আব্বু আর আম্মুকে খুব খুব কষ্ট দেয়। এই মানুষ দুটো এতটাই কষ্ট পেয়েছিলেন যে, আমার সাথে কষ্টে ঠিকমতো কথাই বলতে পারতেন না। আব্বু-আম্মুকে খুব ভালোবাসতাম, তাই আমারও কষ্ট লাগত খুব। প্রথম বছরটা জিদ করে ভালোমতো পড়ে, অসাধারণ একটা রেজাল্ট করবই—এই ছিল টার্গেট।

ফার্স্ট ইয়ার ফাইনালের রেজাল্টটা আব্বু-আম্মুকে জানানোর পর উনাদের চেহারায় যে আনন্দ দেখেছিলাম, তা আমি কোনোদিন ভুলব না। বাবা-মাকে ভেতর থেকে খুশি করতে পারার আনন্দটাই বোধ হয় জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ। এই একটা জিনিস পেলে জীবনে আর বড় কিছু লাগে না বাঁচার জন্যে। যা-ই হোক, আমার ভালো ছাত্রত্বের ব্যাজ সমাজ আমাকে ফিরিয়ে দিলো, শুরু হলো আমার সিলেবাস ও পড়াশোনা বর্জন কর্মসূচি।

ছোটবেলা থেকেই খুব বই পড়তাম আমি। পাঠ্যবইয়ের বাইরের প্রতিটা বইয়ের সাথেই আমার নাড়িভুঁড়ির বাঁধন। আমি বই পড়ি, খাই, পান করি, ঘুমাই। বার্ট্রান্ড রাসেল, হুমায়ুন আজাদ, আরজ আলী মাতুব্বর, রিচার্ড ডকিন্স আর জাফর ইকবালের অন্ধভক্ত এই আমাকে ফার্স্ট ইয়ার আর সেকেন্ড ইয়ারে মলিকিউলার বায়োলজি আর বায়োকেমিস্ট্রি পড়তে হয়েছিল। মলিকিউলার বায়োলজি সেইরকম মজা লাগত, আর বায়োকেমিস্ট্রি ছিল যম! আমার বায়োকেমিস্ট্রির ভয় দূর হয় বন্ধু দীপেশ দাশের হাত ধরে। এরকম ভয়াবহ মেধাবী একটা ছেলে আমি আমার জীবনে দেখিনি। তবে ঘুণে ধরা এই অন্ধকার সমাজের মার্কস সিস্টেমের কানাগলিতে সে ঠিক ঠিক মহা

ধরা খেয়ে বসে আছে। যা হোক, সেই ওরই হাত ধরে আমি বায়োকেমিস্ট্রিরও প্রেমে পড়লাম।

টেক্সটবুকের পাশাপাশি বাইরেও মলিকিউলার বায়োলজি আর বায়োকেমিস্ট্রির যা বই পেতাম, গোগ্রাসে পড়তাম আর হা হয়ে যেতাম। এই দুটো সাব্জেক্ট আমাকে কোষের জগৎ চিনিয়েছিল, সেই জগতের নিয়মকানুন আর গণিত শিখিয়েছিল। কোষ আর কোষের ভেতরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ডিজাইন, প্রতিটা ডিজাইনের পেছনের উদ্দেশ্যের হাতছানি, কমনসেন্স আর দর্শন আমাকে এত এত ধাক্কা দিত যে, আমি আরও পড়তাম, আরও পড়তাম। ইন্টারনেটে ঢুকে ভিডিও দেখতাম, আর বুঝতে চাইতাম।

আমার একলা যাত্রা, একলা পথচলা। ব্যাকটেরিয়ার বাঁইবাঁই করে ঘুরতে থাকা লেজ আর মাইক্রোটিবিউলের রেললাইন আমার মাথাকে ঘুরিয়ে মারত। এ যেন নিজের মাঝেই আরও কয়েক বিলিয়ন-ট্রিলিয়ন বিশ্বজগৎ! এত এত বিস্তৃত পরিসরে যে, আমি কিছুই জানতাম না, কিছুই না। রিচার্ড ডকিন্সদের পপুলার সায়েন্সের বইগুলোকেই ঈশ্বর মেনে পড়তাম আর ভাবতাম—সব জেনে ফেলেছি। মলিকিউলার বায়োলজি আর বায়োকেমিস্ট্রি পড়তে পড়তে আমার গভীরে গাঁথা অহংকার ধীরে ধীরে সরে গেল। অন্তত আমার এভাবেই ভাবতে ভালো লাগে আর কী!

দেহের ভেতরে এত এত সিস্টেম আর ডিজাইন, অসাধারণ সব মলিকিউলের সুনির্দিষ্ট সব কাজ, সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যপূর্ণ নিয়তি বার বার শুধু একজন ট্যালেন্ট মেকানিকের দিকেই আঙুল তুলে দেখাচ্ছিল আমাকে। অনেক অনেক দেরিতে হলেও বুঝলাম, একজন মেকানিক আছে। থাকতেই হবে। সেই মেকানিকের ক্রিয়েটিভ আর্ট আর সুপিরিয়র ডিজাইন তো চোখের সামনেই দেখছি, বুঝছি, কিন্তু পরিচয়? পরিচয় তবে কোথায় পাব? সবাই বলে মেকানিক নিজেই নাকি তাঁর পরিচয় দিয়ে যুগে যুগে পাঠিয়েছেন মানুষের কাছে, যাতে মানুষ তাঁকে চিনতে পারে, কাছে যেতে পারে। মানুষ এগুলোকে ধর্মগ্রন্থ বলে। অগত্যা আর কী করা? সেখানেই ঝাঁপ!

বেদ, বাইবেল আর কুরআনে সত্যকে খোঁজা শুরু হলো। দাবি করা ধর্মগ্রন্থগুলোর রাফ ইংরেজি অনুবাদ আর ইউটিউব লেকচারে চোখ গুঁজে থাকতাম ক্ষ্যাপার মতো। সকালে লাশের মতো তীব্র ঘুম, নয়তো রাতজাগা লাল চোখ নিয়ে মাঝেমাঝে ক্লাসে ঢুঁ মেরে পার্সেন্টেইজ বাঁচানো, এতসব পাগলা খাটুনির পরেও শান্তি লাগত, শুধু নিজেকে বুঝাতাম—'এইত্তো আরেকটু, আরেকটু সামনেই পেয়ে যাবে।' সত্য যেখানে পাব, সেখানেই যাব—এই ছিল আমার জেদ। মুসলিমের ঘরে জন্ম হলেও হিন্দু বা খ্রিষ্টান হয়ে যাব, যদি সেখানেই আলটিমেট সত্যকে খুঁজে পাই। যদি বিকৃতির প্রমাণ আর কনট্রাডিকশান না পেতাম, হয়ে যেতামও সত্যি। মনে আছে, একদিন

মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বলেছিলাম,

‘ও আল্লাহ, আমি জানি না তুমি সত্যিই আছো কি না। তুমি যে আছোই—সেটা যেমন জোরগলায় বলতে পারি না, আবার তুমি যে নেই—সেটাই বা কীভাবে বলি? আমি জাস্ট জানি না। কিচ্ছু জানি না। যদি তুমি সত্যিই থেকে থাকো, তাহলে আমাকে পথ দেখাও, প্লিজ। তুমি যদি আসলেই থেকে থাকো, তাহলে তোমাকে চেনাও, প্লিজ। প্লিজ, প্লিজ!’

মলিকিউলার বায়োলজির হাত ধরেই আমি প্রথম আমার অসাধারণ ডিজাইনারের সামনে নতশিরে দাঁড়াই। লুটিয়ে পড়ি লজ্জায় আর অপরাধের গ্লানিতে। আল্লাহর অস্তিত্ব, নবি হিসেবে মুহাম্মাদের ﷺ সত্যতা, আর কুরআন আল্লাহর বাণী হওয়ার প্রমাণগুলো সব একে একে পড়াশুনা করে বুঝে নেয়ার পরে অবনত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়া ছাড়া কি আর কোনো উপায় বাকি থাকে?

থাকে না।

অতএব, ইসলামকে জেনে-বুঝে গ্রহণ করে নিলাম। আঁকা হলো ইসলামের পবিত্র রাজপথে আমার প্রথম দৃপ্ত পদচিহ্ন। এরপর একটু একটু করে সমর্পিত হতে চাওয়া। সাড়ে তিন বছরের নাস্তিকতা আমার জীবনকে যে পঙ্কিল ঘূর্ণিপাকে ঘুরিয়েছে, তা থেকে বের হওয়া তো আর এক দিনে সম্ভব নয়। নিজের প্রবৃত্তি আর সমাজ-সংস্কৃতির পূজারি ‘আমার’ সাথে শুরু হলো এক আল্লাহর পূজারি ‘আমার’ যুদ্ধ।

শুরু হলো চেষ্টা। মুসলিম হবার চেষ্টা, সমর্পিত হবার সাধনা। আত্মসমর্পণের চেষ্টা। আত্মাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণের চেষ্টা। পশুত্বেরও নীচ স্তর থেকে উঠে দুনিয়াভর্তি মানুষের মাঝে মানব ইতিহাসের সবচাইতে অসাধারণ মানুষটার মতো হওয়ার চেষ্টা। আমার অতীতের অজস্র কালো মেঘে ঢাকা অন্ধকার আকাশ আমাকে বার বার হোঁচট খাওয়ায়, পথ দেখতে দেয় না। কত শতবার উলটে পড়ে যাই। জামা ছিঁড়ে যায়, হাড় ভেঙে যায়, রক্তাক্ত হই কষ্টে। আবার উঠি, আবার হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খাওয়া। ভয়ংকর ভয়ংকর সব তীব্র ব্যথায় খালি চোখ দুটো লোনা হয়ে গাল ভাসিয়ে দেয়। তবুও আশার বাণী আমাকে আলো দেখায়। সেই আলোয় ভর করেই আমি উঠে বসি, চোখ মুছে শক্ত পায়ে দাঁড়াই। না থামার দৃঢ় প্রত্যয়ে আবারও পা বাড়াই সামনে। চলতে থাকি।

জানেন? জান্নাতের বাগিচায় আর কলকল করে বয়ে যাওয়া টলটলে জলে আমার এই ক্ষতবিক্ষত পা দুটোকে ভেজাব বলে আজও স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন দেখি আপনার সাথে জান্নাতের বাগানে পাশাপাশি শুয়ে চিন্তামুক্ত হয়ে একটানা নীল আকাশ দেখব। ওই বাগান আর ঝরনার পানি আমি এক বার ছুঁয়ে দিতে পারব কি না, জানি না। জানি

না, এই পথের শেষ সীমানায় আমি পৌঁছাতে পারব কি না; পুরষ্কারের যোগ্য কি কোনোদিন হব, নাকি অন্ধকার কোনো ফাটলে আটকে সুতীব্র যন্ত্রণার চিৎকারেই আমার শেষ পরিণতি? আমি জানি না।

শুধু জানি আশা আছে। এমন স্নেহময়, তীব্র দয়ালু একজন স্রষ্টা আমার পালনকর্তা— এটা ভাবলেই চোখ ভিজে আসে। আশা বেড়ে যায়। মনে হয়, আমার এই পথচলাতেই সাফল্য। তিনি আমার এই ক্ষতবিক্ষত পথচলার ক্লান্তিকে বৃথা যেতে দেবেন না। আমার আমরণ অবিরাম ভুল-ভ্রান্তি আর কমতিগুলোকে ঠিকই তিনি ঢেকে দেবেন পরম যত্নে আর ভালোবাসায়, এই স্বপ্ন আর আশা নিয়ে বুক বেঁধে ফেলি বার বার।

আর তাই, পারব না বুঝেও জানি, শুধু হাঁটতে হবে এই পথেই। সামনেই হেঁটে যেতে হবে।

তাই হাঁটি, আর হাঁটতে থাকি। অবিরাম।

আলোর রেখা ধরে।[১]

[১] 'প্রত্যাবর্তন' বইতে যারা এই লেখাটা পড়েছেন, তারা একটু পরেই বুঝতে পারবেন, এই লেখাটা কেন এখানে খুব বেশি দরকার ছিল।

আলোর রেখা

ধর্ম নিয়ে যারা গভীরে পড়েনি, জানেনি, তাদেরকে একটা কথা প্রায়ই বলতে শুনেছি, 'সব ধর্ম আসলে একই কথা বলে। একটা মানলেই হলো।' এত বড় একটা ফালতু কথা মানুষ পাবলিকলি বলে যায়, একটুও বুক কাঁপে না!

আল্লাহর এক অশেষ নিয়ামত যে, মূলনীতির জায়গায় প্রত্যেকটা বিখ্যাত ধর্ম একটা আরেকটার সাথে ভয়াবহ সাংঘর্ষিক। একদম চুলোচুলি করবে টাইপের অবস্থা! আর ইসলামের বক্তব্যের সাথে তো মূলনীতির জায়গায় সবাই মুখ ফিরিয়ে বসে। আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহকে এই জন্য থ্যাঙ্কস বলছি, কারণ ব্যাপারটা এখন মাথা খাটিয়ে গণিত কষার মতো সহজ হয়ে গেল। একটা সত্য হলে, আরেকটাকে যে মিথ্যা হতেই হবে। তাহলে আমাকেই ভেবে-খুঁজে নিরপেক্ষভাবে অবিকৃত আর সঠিক কোনটা বের করতে হবে, মানতে হবে। দায়িত্বটা এখন তাই আমার কাঁধে; পরিণতিও। অন্য কাউকে দোষ দিয়ে পার পাওয়ার কোনো সুযোগ আর রাখা হয়নি।

এমনকি মুসলিম হয়ে জন্মালেও আপনাকে সঠিক বক্তব্য আর বুঝটা খুঁজে ছেঁকে নিতেই হবে, নইলে...

এই পরীক্ষাটা তাই সবার জন্যেই। আলহামদুলিল্লাহ।

এই পরীক্ষার অন্ধকার রাস্তায় ঠিকভাবে হাঁটতে হলে চাই আলো। পরিষ্কার ঝকঝকে আলো। যে আলোতে সব সন্দেহ-সংশয় আর প্রশ্নের আঁধার কেটে যাবে, প্রতিটা উত্তরকে দিনের আলোর চাইতেও বেশি দীপ্তিময় মনে হবে। কোথায় পাই এমন আলো? আলেয়া নয়; বরং সত্যিকারের আলো?

স্রষ্টার বাণী হচ্ছে সেই আলো। অপার্থিব আলো। যে আলোর রেখায় পার্থিব আর অপার্থিব—দুই জীবনেই পথ চলা যায় সহজে, পৌঁছানো যায় সাফল্যে। সাফল্য কী? সত্যিকারের সাফল্যের পরম সংজ্ঞা তো কেবল স্রষ্টার কাছ থেকেই আসা সম্ভব। ঠিক

না? যখন আবিষ্কার করলাম, কুরআন হচ্ছে সেই অপার্থিব আলোর সর্বশেষ রেখা, তখন খুঁজে নিতে হয়েছিল, বুঝে নিতে হয়েছিল, কেন এই কুরআনকে সত্যিই স্রষ্টার বাণী হিসেবে দাবি করা হয়। দাবিটা কি পুরোপুরি সত্যি? কীভাবে ভালোভাবে বুঝে নিতে পারব যে, এই কুরআন আসলে মানুষের রচিত বানোয়াট কিছু নয়?

স্রষ্টার পাঠানো সত্যকে অনুসরণ করার তীব্র ইচ্ছা নিয়ে আপনি পা বাড়াবেন, আর ন্যায়বিচারক মমতাময় স্রষ্টা আপনাকে পথ দেখাবেন না—এটা কখনোই হয়নি, হয় না। আমার ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। স্রষ্টা নিজ ভালোবাসা আর দয়ায় একের পর এক প্রমাণ আমার সামনে এনে দিয়েছেন, দিনের আলোর মতো ঝকঝকে পরিষ্কার করে ফুটিয়ে তুলেছেন সত্যকে। আলহামদুলিল্লাহ। সেই সত্য যেন আপনাকে আজ সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলতে পারি, সেই সামর্থ্যও আমি আমার স্রষ্টার কাছেই চাই।

কুরআন কি সত্যিই একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহর বাণী? ভালো গবেষণা আর বিশ্লেষণের অভাবে অমুসলিমরা তো বটেই, এমনকি অনেক মুসলিমও প্রায়ই বিভিন্ন কারণে সংশয়-সন্দেহে পড়ে হাবুডুবু খান। আগের দুটো বই 'উল্টো নির্ণয়' আর 'কে উনি?' যারা পড়েছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় তারা এই ব্যাপারে অনেক রকম বিচ্ছিন্ন প্রমাণ পেয়েছেন। এই বইতে ইনশাআল্লাহ সবগুলো প্রমাণকে সাজিয়ে গুছিয়ে ক্রমানুসারে উপস্থাপন করা হবে। পাশাপাশি প্রমাণগুলো বুঝে নেয়ার পরবর্তী করণীয় নিয়েও সাধ্যমতো কিছু পথ-নির্দেশনা দেয়ার চেষ্টা থাকবে ইনশাআল্লাহ।

তো, বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা যাক!

শুনি কার বাণী?

কুরআন আল্লাহর বাণী না হলে, আর একটাই দাবি বাকি থাকে। আর সেটা হচ্ছে, কুরআন মানুষেরই রচনা। যেহেতু নির্ভুল ইতিহাস সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে যে, সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকেই মানুষ প্রথম কুরআন শুনেছে, তাই ('কুরআন মানুষের রচনা' শীর্ষক) দাবিটার সবটুকু সব সময় তাঁর দিকেই তাক করা থাকে। অর্থাৎ মুহাম্মাদই ﷺ এই কুরআনের রচয়িতা, এই দাবিটাই সবাই করে থাকে। বুঝে করুক, বা না বুঝে।

আমরা তাই এই দাবিটার স্বরূপ কেমন, সেটা প্রথমে খুঁটিয়ে দেখব। বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করব, এই দাবিটার কয়টা শাখা রয়েছে। এরপরে একে একে প্রতিটা শাখা নিয়ে সহজ আলোচনা করব। যদি দেখা যায়, শাখাগুলোর প্রতিটা গোড়াতেই রয়েছে কেবল মিথ্যা আর ভুলের শেকড়, তাহলে প্রমাণ হয়ে যাবে যে, এই কুরআন মুহাম্মাদ তথা কোনো মানুষের রচনা নয়। আর কুরআন যদি কোনো মানুষের রচনা না হয়ে থাকে, তাহলে তো একটা সুনিশ্চিত উপসংহারই বাকি থাকে। তা-ই না?

মন দিয়ে চিন্তা করলে দেখবেন, 'মুহাম্মাদই ﷺ কুরআনের রচয়িতা'—এই দাবিটাকে সর্বোচ্চ চার রকম সম্ভাবনায় ভাগ করা যায়। দেখা যাক, সেই চারটা সম্ভাবনা কী কী? গভীর ভাবনা এবং বোঝার সুবিধার্থে চারটা সম্ভাবনার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও জোরালো শব্দগুলোকে গাঢ় করে দেয়া হয়েছে।

তাহলে বুঝে নিই, কী সেই চার সম্ভাবনা।

১। **শয়তানের (ডেভিলের) সাহায্য পেয়ে** কুরআন রচনা করেছেন।

২। পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থ, তথা তাওরাত, ইঞ্জিল (বাইবেল) থেকে বিভিন্ন ঘটনা, তথ্য ইত্যাদি টুকে নিয়ে কুরআন রচনায় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে **তাওরাত, ইঞ্জিলের জ্ঞান আছে—এমন কারও সাহায্য নিয়েছেন।**

৩। **কারও কোনো সাহায্য না নিলেও**, মুহাম্মাদ ﷺ ঠিকই স্রষ্টার প্রেরিত পূর্ববর্তী

বাণী, যেমন : **তাওরাত, ইঞ্জিল (বাইবেল) এর** বিভিন্ন ঘটনা, তথ্য ইত্যাদি থেকে **একা একাই** তথ্য টুকে নিয়ে কুরআন রচনা করেছেন।

৪। **কারও কোনো সাহায্য ছাড়াই** মুহাম্মাদ ﷺ এই কুরআন **একা একাই** রচনা করেছেন।

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা এই চারটা সম্ভাবনাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখব, বুঝব। সত্যকে বোঝার জন্য। বুঝে মেনে নেয়ার জন্য।

ঠিক আছে?

সুন্দরের পাঠ অসুর থেকে?

আচ্ছা বলুন তো, মিথ্যা বলতে কে আদেশ করে?

খুন করতে?

ব্যভিচারের প্ররোচনা কে দেয়?

চুরি করতে কিংবা ঘুস খেতে কে বলে?

ভালো পথে থাকলে কে ভয় দেখায়, বাধা দেয়?

খারাপ কাজের আদেশ কে দেয়?

পিতামাতার অবাধ্য হবার অনুপ্রেরণা কার কাছ থেকে আসে?

মদ খাওয়ার কারণে সমাজে এত অশান্তি, চিন্তাশক্তি খুইয়ে ফেলা, মাতাল হয়ে অন্যের শ্লীলতাহানি করা, রেইপ, এক্সিডেন্ট, খুন-সহ যাবতীয় রাহাজানি আর বিপর্যয় সত্ত্বেও কে মদ খাওয়ার অনুপ্রেরণা দিতে পারে?

জুয়ার কারণে পারিবারিক আর সামাজিক জীবনে অজস্র বিশৃঙ্খলার কথা কে না জানে? এই জুয়ার উৎসাহ কার পক্ষ থেকে আসা সম্ভব?

নির্লজ্জতা আর অপকর্মের আদেশ কে দেয়?

কে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করতে বলে?

গরিব-দুঃখীদের দেখাশোনা করতে, মানুষকে সাহায্য করতে, দান করতে নিষেধ করে কে?

কে সন্তান কিংবা মানুষ হত্যার প্ররোচনা দেয়?

শয়তান, নাকি আল্লাহ?

শুধু আপনিই না, যেকোনো বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এক বাক্যে ঘোষণা দিতে বাধ্য, নিশ্চয়ই এগুলো শয়তানের পক্ষ থেকে। আর কেবল একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহই এসব শয়তানি থেকে বেঁচে থাকতে বলেন, আদেশ করেন, ভালো থাকার উৎসাহ দেন। আর চিনিয়ে দেন শয়তানকে আমাদের প্রকাশ্য শত্রু হিসেবে।

অনেকেই বলে, কুরআন শয়তানের কাছ থেকে এসেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, শয়তান কি কক্ষনো নিজেকে আমাদের প্রকাশ্য শত্রু হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেবে? খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে? নিজেকে অভিশপ্ত আর ঘৃণিত হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেবে? বুঝতে চাইলে আসুন, নিচে দেয়া কুরআনের প্রতিটা কথা বুঝে দেখি।

'হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা আছে, তার মধ্য থেকে হালাল উত্তম জিনিসগুলো খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চোলো না। অবশ্যই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'[২]

কথাটা আবারও পড়ুন। অনুভব করুন। চিন্তা করুন, শয়তানকে প্রকাশ্য শত্রু হিসেবে কে চিহ্নিত করে দিতে পারে?

'হে বিশ্বাসীরা! ইসলামের মধ্যে পূর্ণভাবে প্রবেশ করো, এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চোলো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'[৩]

'হে বিশ্বাসীরা! অবশ্যই মদ, জুয়া, মূর্তি ও ভাগ্য নির্ধারক তির ঘৃণিত শয়তানি কাজ। তোমরা তা বর্জন করো, যেন তোমরা সফল হতে পারো।'[৪]

'শয়তান যদি উসকানি দিয়ে তোমাকে প্ররোচিত করতে চায়, তাহলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। নিশ্চয়ই তিনি হলেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'[৫]

'নিশ্চয়ই যারা সচেতনতা অবলম্বন করে, শয়তানের ছোঁয়ায় কুমন্ত্রণা জাগলেই তারা আল্লাহকে স্মরণ করে, আর ফলে তাদের অন্তর্চক্ষু খুলে যায়।'[৬]

'হে বিশ্বাসীরা! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে, সে (শয়তান) তাকে নির্লজ্জতা ও অপকর্মের আদেশ

---

[২] সূরা বাকারা, ২ : ১৬৯
[৩] সূরা বাকারা, ২ : ২০৮
[৪] সূরা মায়িদা, ৫ : ৯০
[৫] সূরা আরাফ, ৭ : ২০০
[৬] সূরা আরাফ, ৭ : ২০১

দেবে...'[৭]

'শয়তানের পক্ষ থেকে তুমি যদি কুমন্ত্রণা অনুভব করো, তাহলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'[৮]

'শয়তান তাদের ওপর প্রভাব খাটিয়ে বসেছে, আর তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। জেনে রাখো, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত।'[৯]

পড়া হয়েছে কথাগুলো? বুঝা হয়েছে মন দিয়ে? আচ্ছা, নিচের এই আয়াতটা দেখুন তো এক বার! 'তুমি যখনই কুরআন পড়বে, তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে।'[১০]

যে বই আপনাকে শয়তানের কাছ থেকে আশ্রয় নিতে শেখায়, শয়তান এবং তার পথকে ঘৃণিত বলে পরিচয় করিয়ে দেয়, সেই বই আর বাণীকে কি কেউ শয়তানের পক্ষ থেকে আগত বলতে পারে? যদি বলে, তাহলে হয় সে পাগল, নয়তো তার মাথায় সমস্যা। ঠিকই ধরেছেন। সত্যি কথার ফাঁকে ফাঁকে মজা করে সত্যি কথা বলছি। হাহাহা, এরকম illogical (অযৌক্তিক) কথাবার্তা শুনলে হাসব না, তো কী করব?

কী মনে হয় এখন? এগুলো কি শয়তানের কথা হতে পারে? সম্ভব, বলুন? কক্ষনো না। নিঃসন্দেহে ওপরের কথাগুলো এটাই প্রমাণ করে যে, এই বাণীগুলো এমন একজনের পক্ষ থেকে এসেছে—যিনি চান আমরা যেন শয়তানকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি, তার কাছ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারি। শয়তানের জঘন্য পথ আর কলাকৌশল পেরিয়ে, পবিত্র এবং ভালো একজন মানুষ হিসেবে একমাত্র জীবনটাকে যেন শুদ্ধভাবে যাপন করতে পারি।

---

[৭] সূরা নূর, ২৪ :২১
[৮] সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৩৬
[৯] সূরা আল-মুজাদিলা, ৫৮ : ১৯
[১০] সূরা আন-নাহল, ১৬ : ৯৮

কুম্ভীলকবৃত্তি?

অনক্ষর বার্তাবাহক

একথা সবারই জানা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লিখতে ও পড়তে জানতেন না। উনার ﷺ এই অক্ষরজ্ঞান না থাকার বিষয়টা কুরআনের অপার্থিব ও অলৌকিক হওয়ার ব্যাপারে আরও একটা নতুন অধ্যায় যুক্ত করে। এমনকি পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ এই বিষয়ে কথা বলেছেন। দেখুন না, ৭ নং সূরার ১৫৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

'যারা অনুসরণ করে রাসূলের, উম্মী নবির, যার উল্লেখ তারা তাদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ পায়, যিনি তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেন, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেন; তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেন, আর অপবিত্র বস্তু হারাম করেন।

আর তাদেরকে তাদের গুরুভার ও শৃঙ্খল হতে মুক্ত করেন, যা তাদের ওপর ছিল। কাজেই যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে, তাঁকে সম্মান করে, তাঁকে সাহায্য করে এবং যে নূর তাঁর সাথে নাযিল হয়েছে, সেটার অনুসরণ করে, তারাই সফলকাম।'[১১]

একটা তাফসীরে[১২] ওপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় 'উম্মী নবির' বিশ্লেষণ এসেছে :

'...কারও কারও মতে "উম্মী" শব্দটি "উম্ম" শব্দের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে বলা হয়েছে। আর উম্ম অর্থ মা। অর্থাৎ সে, তার মা তাকে যেভাবে প্রসব করেছে, সেভাবে রয়ে গেছে। কারও কারও মতে, শব্দটি "উম্মত" শব্দের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে বলা হয়েছে। পরে সম্পর্ক করার নিয়মানুসারে "তা" হরফটি পড়ে গেছে। তখন অর্থ হবে, উম্মতওয়ালা নবি। কারও কারও মতে, শব্দটি "উম্মুল কুরা"—যা মক্কার একটি নাম,

---

[১১] সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৫৭

[১২] তাফসীরে জাকারিয়া

সেদিকে সম্বন্ধযুক্ত করে বলা হয়েছে। অর্থাৎ মক্কাবাসী। [বাগভী]...'

'আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুটি পদবি "রাসূল" ও "নবি" এবং এর সাথে সাথে তৃতীয় একটি বৈশিষ্ট্য "উম্মী"-এরও উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবনু আব্বাস বলেন, "(أُمِّيٌّ) 'উম্মী' শব্দের অর্থ হলো নিরক্ষর। যে লেখা-পড়া কোনোটাই জানে না।" [বাগভী]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও বলেছেন, "আমরা নিরক্ষর জাতি। লিখা জানি না, হিসাব জানি না।"[১৩]

সাধারণ আরবদেরকে এ কারণেই কুরআন "উম্মিয়্যিন" (أُمِّيِّينَ) বা নিরক্ষর জাতি বলে অভিহিত করে বলছে যে, তাদের মধ্যে লেখা-পড়ার প্রচলন খুবই কম ছিল।...'

'...বিখ্যাত মত হচ্ছে যে, "উম্মী" অর্থ নিরক্ষর। যদিও নিরক্ষর হওয়াটা কোনো মানুষের জন্য প্রশংসনীয় গুণ নয়; বরং ত্রুটি হিসেবেই গণ্য। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জ্ঞান-গরিমা, তত্ত্ব ও তথ্য অবগতি এবং অন্যান্য গুণবৈশিষ্ট্য ও পরাকাষ্ঠা সত্ত্বেও উম্মী হওয়া তাঁর পক্ষে বিরাট গুণ ও পরিপূর্ণতায় পরিণত হয়েছে। কারণ শিক্ষাগত, কার্যগত ও নৈতিক পরাকাষ্ঠা যদি কোনো লেখাপড়া জানা মানুষের দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহলে তা হয়ে থাকে তার সেই লেখাপড়ারই ফলশ্রুতি; কিন্তু কোনো একান্তই নিরক্ষর ব্যক্তির দ্বারা এমন অসাধারণ, অভূতপূর্ব ও অনন্য তত্ত্ব-তথ্য ও সূক্ষ্ম বিষয় প্রকাশ পেলে, তা তার প্রকৃষ্ট মুজিযা (অলৌকিক, মিরাকল) ছাড়া আর কী হতে পারে?'

এই গ্রন্থ ছাড়াও প্রায় সব তাফসীরের গ্রন্থগুলোতে প্রাজ্ঞ স্কলাররা ওপরের আয়াতের অনুবাদে 'নিরক্ষর নবি' লিখেছেন। ডক্টর মোহাম্মদ ফজলুর রহমান তার 'আল মুজামুল ওয়াফী' অভিধানে 'উম্মী' শব্দের অর্থ 'নিরক্ষর' করেছেন। তাফসীরে ইবনু কাসীর, তাফহীমুল কুরআন, তাফসীর আহসানুল বায়ান, তাফসীরে ফাতহুল মাজীদ, তাফসীরে মাযহারী-সহ আরও কয়েকটি স্বীকৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'উম্মী' শব্দের একই অনুবাদ (নিরক্ষর) করেছেন।

এবারে আল-কুরআনের ২৯ নং সূরার ৪৮ নং আয়াতটা পড়ে আসা যাক। এখানে আল্লাহ বলছেন,

'তুমি তো এর পূর্বে কোনো গ্রন্থ পাঠ করতে না[১৪] এবং তা নিজ হাতে

[১৩] বুখারি; ১০৮০

[১৪] (তুমি তো এর পূর্বে কোনো গ্রন্থ পাঠ করতে না) কারণ, তিনি নিরক্ষর ছিলেন।

লিখতেও না যে,[১৫] মিথ্যাবাদীরা (তা দেখে) সন্দেহ পোষণ করবে।[১৬]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর[১৭] বলছে :

বলাই বাহুল্য যে, একজন অনক্ষর ব্যক্তির পক্ষে কুরআনের মতো উচ্চমার্গের সাহিত্য সংবলিত রচনা তৈরি করা কখনোই সম্ভব না। ওপরন্তু, সেই সময়ে আরবিতেও বাইবেল অনূদিত হয়নি।

এরপরেও যেসব অতি-জ্ঞানী (!) মানুষ ভুলভাল দাবি করে ফেলেন যে, মুহাম্মাদ বাইবেল থেকে চুরি করে কুরআন রচনা করে বসে আছে, তাদের কানের কাছে গিয়ে চিৎকার করে কিছু কথা বলতে চাই; কিন্তু বলব না।

চুপিচুপিই বলি।

প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাইবেলের সেন্সরশীপ (Censorship of the Bible) অনুযায়ী, কোনো সাধারণ মানুষের কাছে বাইবেলের মূল কপি বা অনূদিত কোনো কপি রাখার ও পড়ার অনুমতি তো ছিলই না; বরং এর ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা ছিল। আরবি ভাষায় সবচাইতে পুরাতন যে বাইবেলটা পাওয়া যায়, সেটা অনূদিত হয়েছিল ৯ম শতাব্দীতে। রাসূলুল্লাহর মৃত্যুর ২৩৪ বছর পরে ৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে বিশর ইবনুল সিররি নামের একজন ব্যক্তি আরবিতে বাইবেলের অনুবাদ করেন, যা ১৯ শতকে সিনাই পর্বতের পাদদেশে সেইন্ট ক্যাথরিন আশ্রমে পাওয়া যায়। তাও এতে শুধুমাত্র আরামাইক (সিরিয়াক) ভাষা থেকে মূল বাইবেলের কিছু অংশ অনূদিত হয়েছিল (কেবল Book of Acts and The Epistles)। এই পাণ্ডুলিপির নাম 'মাউন্ট সিনাইয়ের হস্তলিখিত আরবি পুঁথি' (Mount Sinai Arabic Codex 151)।[১৮] [১৯] একই আশ্রমে পাওয়া ৯ম শতাব্দীতে অনূদিত Codex Arabicus-এ শুধুমাত্র John ৯ : ১৬-৩৮ অংশটুকু আরবিতে পাওয়া যায়।[২০], [২১]

---

[১৫] (এবং তা নিজ হাতে লিখতেও না যে,) কারণ, লেখার জন্যও শিক্ষা আবশ্যিক, যা তিনি কারোর নিকট থেকে অর্জন করেননি।

[১৬] (মিথ্যাবাদীরা (তা দেখে) সন্দেহ পোষণ করবে।) অর্থাৎ, যদি তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি হতেন বা কোনো শিক্ষকের নিকট কিছু শিখতেন, তাহলে লোকে বলত যে, কুরআন মাজীদ অমুকের সাহায্যে (রচিত গ্রন্থ) বা অমুকের নিকট শিক্ষার ফল।

[১৭] তাফসীরে আহসানুল বায়ান

[১৮] Shirley Madany (1986). "The Treasures of St. Catherine's Monastery" https://tinyurl.com/5cvjxtnh

[১৯] "The Arabic Bible Manuscript Mt Sina Arabic Codex 151". https://tinyurl.com/yc79w9a9 Archived from the original on 2006-02-09. www.arabicbible.com/bible/codex_151.htm

[২০] https://tinyurl.com/38du69x6

[২১] https://en.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B8yen_Collection

এবার সারসংক্ষেপ করা যাক।

প্রথমত, ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, রাসূলুল্লাহর ﷺ কোনো অক্ষরজ্ঞান ছিল না। ওপরন্তু রাসূলুল্লাহর ﷺ সময়ে আরবিতে কোনো বাইবেল ছিল না যে, অক্ষরজ্ঞান থাকলেও তিনি তা লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে সেখান থেকে চৌর্যবৃত্তির মাধ্যমে কুরআন রচনা করবেন। এছাড়াও 'কে উনি?' বইতে বিস্তারিত আলোচনা-সহ প্রমাণ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ মিথ্যাবাদী ছিলেন না; বরং একজন সত্য নবি ছিলেন। আগ্রহীরা সেটাও দেখে নিতে পারেন।

এখানেই শেষ করা যেত, কিন্তু আরও আছে!

যারা এই বিষয়গুলো নিয়ে সিরিয়াসলি পড়াশোনা করেন, তারা সবাই জানেন যে, ইতিহাস বা বিজ্ঞানের বই না হওয়া সত্ত্বেও কুরআনের ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বর্ণনাগুলো বার বার বাইবেলের সাথে সাংঘর্ষিক প্রমাণিত হয়েছে। শুধু কি তা-ই? উলটো ইতিহাসবিদদের কষ্টিপাথরে বার বার কুরআনের বর্ণিত তথ্যগুলোই সত্য প্রমাণিত হয়ে এসেছে, এবং এখনো হচ্ছে। সামনের লেখাগুলোতে আপনার বোঝার সুবিধার জন্য সেখান থেকেও কিছু আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

তবে, বিনয়ী আর বুদ্ধিমান সত্যের অনুসারীদের জন্য একটা প্রমাণই যথেষ্টের চাইতেও বেশি হয়ে যায়, ঠিক না?

বিদ্বানের দ্বারে পরিত্যাজ্য দুর্জন?

কোনো স্কলারের কাছ থেকে কি মুহাম্মাদ ﷺ ইতিহাস বা ধর্মবিষয়ক জ্ঞান অর্জন করে কুরআন রচনা করেছেন? এটা কি সম্ভব? ব্যাপারটা সঠিকভাবে বুঝতে হলে আমাদেরকে মুহাম্মাদের ﷺ জীবন আর ইতিহাস জানতে হবে, পাশাপাশি সঠিকভাবে বিশ্লেষণও করতে হবে।

ইতিহাস বলছে, পুরো জীবনে মুহাম্মাদ ﷺ সর্বমোট **চারটি** ভিন্ন স্থানে অবস্থান করেছেন।

জন্মের পর থেকে ৪ বছর বয়স পর্যন্ত দুধ-মা হালিমার সাথে বনু সাদ গোত্রে (**প্রথম** স্থান) ছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ। বলা বাহুল্য, এই চার বছর বয়সের মাঝে উনার সাথে কোনো স্কলারের পরিচয় বা জ্ঞানার্জনের সুযোগ ঘটেনি। এরপরে মক্কাতেই (**দ্বিতীয়** স্থান) তিনি বাস করেছেন ৫৩ বছর বয়স পর্যন্ত। এর মাঝে ১২ বছর বয়সে ব্যবসার কাজে চাচা আবু তালিবের সাথে সিরিয়ায় (**তৃতীয়** স্থান) যান। আরেকবার সিরিয়ায় যান ২৫ বছর বয়সে, খাদীজার ব্যবসার দায়িত্ব নিয়ে। এরপর জীবনের শেষ দশ বছর (৫৩-৬৩ বছর বয়স পর্যন্ত) তিনি মদীনায় (**চতুর্থ** স্থান) বসবাস করেন।

ইতিহাস বলছে, ৪০ বছর বয়স থেকে সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে জীবনের বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অবস্থায় মুহাম্মাদের ﷺ কাছে এই অপার্থিব বাণী আসতে থাকে। তাই কুরআনে বর্ণিত নিখুঁত সব ঐতিহাসিক তথ্য বর্ণনা করতে গেলে (১) মুহাম্মাদকে ﷺ নিজেই একজন গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে, অথবা (২) এই সুদীর্ঘ ২৩ বছর জুড়ে গভীর জ্ঞান আর পাণ্ডিত্যের অধিকারী কোনো স্কলারকে মুহাম্মাদের ﷺ অবিরাম সঙ্গী হয়ে থাকতে হবে, যেন কখনো কোনো ভুল তথ্য কুরআনে সংযোজিত না হয়ে যায়।

আমরা জানি, প্রথমটা অক্ষরজ্ঞানহীন এবং পড়াশোনাবিহীন মুহাম্মাদের ﷺ পক্ষে পুরোপুরিই অসম্ভব। এমনকি তৎকালীন চরমতম শত্রুরাও মুহাম্মাদের ﷺ মতো

এরকম একজন অনক্ষর মানুষের বিরুদ্ধে এরকম বোকাসোকা অভিযোগ এনে নিজেদেরকে হাসির পাত্র বানায়নি।

আর দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে আমরা জানি, এবং ইতিহাসও সাক্ষী যে, এটাও ঘটেনি এবং এমন কিছু ঘটাও অসম্ভব। এরকম কোনো স্কলার বা পণ্ডিতই মুহাম্মাদের ﷺ সঙ্গী হিসেবে ছিল না।

মক্কাতে?

তৎকালীন মক্কা ছিল সভ্যতা থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরের এক জায়গা। এর বেশির ভাগ মানুষই ছিল নিরক্ষর, এবং অশিক্ষিত। এরপরেও মক্কাতে পূর্ববর্তী অপার্থিব জ্ঞানের উৎস খুঁজতে গিয়ে একটা নামই শুধু ইতিহাসবিদদের সামনে এসেছে—ওয়ারাকা ইবনু নাওফাল।

ইতিহাস বলছে, ইতিহাস এবং পূর্ববর্তী ধর্মীয় জ্ঞানে শিক্ষিত বিদগ্ধ স্কলার ওয়ারাকার সাথে মুহাম্মাদের ﷺ প্রথম সাক্ষাৎ হয় চল্লিশ বছর বয়সে, প্রথম ঐশী বাণী পাওয়ার পর। ওয়ারাকা নিজেই মুহাম্মাদের ﷺ কথা শুনে সাক্ষ্য দেয় যে, মুহাম্মাদকে ﷺ স্রষ্টার পক্ষ থেকে নবি হিসেবে মনোনীত করা হচ্ছে, কারণ মুহাম্মাদের ﷺ সাথে ঘটা ঘটনাবলি আগের নবিদের ঘটনাগুলোর সাথে মিলে যাচ্ছে। তিনি এটাও বলেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ যখন সত্যের এই বাণী মানবজাতির মাঝে প্রচার করার জন্য আদেশপ্রাপ্ত হবেন, তখন ওয়ারাকা নিজেও সেই সত্যের কাফেলায় যুক্ত হবেন, যদি বেঁচে থাকেন। সেই সুযোগ তিনি আর পাননি। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই ওয়ারাকা মারা যান। ফলে, মুহাম্মাদকে ﷺ কোনো স্কলারের সান্নিধ্য আর সাহায্য ছাড়াই মক্কা জীবনের বাকি পথটা পাড়ি দিতে হয়।

এই মহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে 'দ্য অরিজিন অফ ইসলাম' নামে এক ইউটিউব ভিডিওতে কড়া সন্দেহবাদী আর ওরিয়েন্টালিস্ট টম হল্যান্ড কী বলে ফেলেছেন, জানেন? কথাগুলো প্রথমে ইংরেজিতে দিচ্ছি, পরে নিজের ভাষায় বুঝিয়ে বলছি।

"The key factor about the traditional account is that Muhammad receives his first revelation in Mecca, and Mecca stands at a fabulous remove from the World of the Roman Empire. … There were no Jews and no Christian in Mecca. … Muhammad was illiterate …if that is the case, … so how to explain this text which full of those sophisticated cultural references except by a miracle. It seems if we are to rely on the Muslim account of how the Qur'an came into being that The Divine

must indeed have penetrated this Miracle."[২২]

"তিনি বলতে চেয়েছেন যে, মুহাম্মাদের ﷺ কাছে প্রথম ঐশী বাণী আসে মক্কায়, যা ছিল রোমান সাম্রাজ্য-সহ যাবতীয় সভ্যতাবিবর্জিত এক জনপদ। এই মক্কায় কোনো ইহুদি এবং খ্রিষ্টান ছিল না। ওপরন্তু মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন অশিক্ষিত, নিরক্ষর একজন মানুষ। এই অবস্থায়, এত এত ঐতিহাসিক রেফারেন্স ও তথ্যসমৃদ্ধ (কুরআনের) কথাগুলোকে অলৌকিক আখ্যা দেয়া ছাড়া আর কীভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? মনে হচ্ছে, 'কুরআন স্রষ্টার পক্ষ থেকে আসা অলৌকিক বাণী' মুসলিমদের এই দাবির ওপর আমাদেরকে নির্ভর করতেই হবে।"

সিরিয়ায়?

আগেই উল্লেখ করেছি, ইতিহাস বলছে, মুহাম্মাদ ﷺ জীবনে দুই বার সিরিয়ায় গিয়েছিলেন। প্রথম বার গিয়েছিলেন ১২ বছর বয়সে, ৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে, চাচা আবু তালিবের সাথে ব্যবসায়িক সফরে। দুর্বল এক বর্ণনায় এসেছে, পথিমধ্যে বুহাইরা নামক এক খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীর আমন্ত্রণে তারা দুপুরের খাবার খান। যদিও ইমাম আয-যাহাবী (রাহ)-সহ অন্যান্য স্কলাররা এই ঘটনাকে বিশুদ্ধ ঘটনা বলে মেনে নেননি, তবুও তর্কের খাতিরে আমরা ধরে নিচ্ছি যে, এই ঘটনাটি সেভাবেই ঘটেছিল, যেভাবে দুর্বল বর্ণনাগুলোতে এসেছে, ঠিক আছে?

সংক্ষেপে বর্ণনানুযায়ী, সিরিয়া যাওয়ার মূল পথেই ছিল খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীর বাসস্থান। তিনি শেষ প্রফেটের আগমনের চিহ্নগুলো সম্পর্কে জানতেন। বাইবেলের জ্ঞান থেকে তিনি জানতেন, কীভাবে শেষ প্রফেটের কাঁধে থাকা বিশেষ চিহ্ন দেখে শেষ প্রফেটকে চিনে নিতে হবে। যাত্রাপথে কিছু বিশেষ নিদর্শন দেখে আবু তালিবের বাণিজ্যিক কাফেলা তার নজরে আসে। ফলে, তিনি কৌতূহলী হয়ে তাদেরকে দুপুরের খাবারের আমন্ত্রণ জানান। চাচা আবু তালিবের অনুমতিক্রমে বালক মুহাম্মাদকে পরীক্ষা করে তিনি বাইবেলে বর্ণিত সেই বিশেষ চিহ্ন পেয়ে বুঝে ফেলেন যে, এই ছেলেটাই বড় হয়ে প্রফেট হিসেবে নির্বাচিত হবে। ব্যাপারটা তিনি চাচা এবং অভিভাবক আবু তালিবকে জানিয়ে দেন। সাথে মুহাম্মাদকে ﷺ ভালোভাবে নিরাপত্তা দানের অনুরোধ করেন, এবং বানী ইসরাঈলিদের (তথা ইহুদিদের) ব্যাপারে সাবধান করে দেন, যেহেতু ইহুদিরা এর আগের প্রফেটদেরকেও বার বার নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

আবু তালিব এই জ্ঞানী বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর উপদেশ মেনে নেন, এবং মুহাম্মাদকে ﷺ কিছু গাইডের সাথে মক্কায় পাঠিয়ে দেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি সামান্য কিছুদিনের

[২২] The Origin of Islam, a YouTube video at Rancho Mirage

জন্য সিরিয়া গিয়ে, মুহাম্মাদকে ﷺ মক্কায় পাঠিয়ে দেন।[২৩]

কিছু ওরিয়েন্টালিস্ট এই দুর্বল বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে দাবি করে থাকেন যে, এই সন্ন্যাসীই মুহাম্মাদকে ﷺ উক্ত সাক্ষাৎকালে সবকিছু শিখিয়ে দিয়েছে। ঐতিহাসিক বর্ণনা হিসেবে চরম দুর্বল হওয়ার পাশাপাশি আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণে এই দাবিকে নিঃসন্দেহে অবাস্তব ও অসম্ভব বলা যায়।

একটাও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক রেফারেন্স বা দলিল নেই, যেখান থেকে সন্দেহ করা যায় যে, মুহাম্মাদ ﷺ উক্ত সন্ন্যাসীর কাছ থেকে কোনো রকম জ্ঞানার্জন করেছেন।

তাদের সাক্ষাৎটাই ছিল মাত্র ঘণ্টাখানেকের।

তার ওপর মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন মাত্র বারো বছর বয়সি একজন বালক।

ওপরন্তু, বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত সাক্ষাতে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বুহাইরা নিজেই ছিলেন প্রশ্নকর্তা (তথ্য আহরণকারী), এবং বালক মুহাম্মাদ ছিলেন ﷺ উত্তরদাতা (অর্থাৎ তথ্যদাতা), উলটোটা নয়।

কুরআন যে পরিমাণ জটিল তত্ত্ব, জ্ঞান আর নির্ভুল সব ঐতিহাসিক তথ্য একের পর এক উপস্থাপন করেছে, সেগুলো কোনোভাবেই এই ছোট্ট এক সাক্ষাতে শুনে, শিখে নিয়ে আরও আটাশ বছর পরে দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে একের পর এক সঠিকভাবে বলতে থাকা পুরোপুরিই অসম্ভব। তার ওপর, উক্ত সাক্ষাতে বাণিজ্যিক কাফেলার ও গোত্রের অন্যান্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। এদের কেউই পরবর্তীকালে এত চরম শত্রুতার পরেও মুহাম্মাদের ﷺ বিরুদ্ধে সন্ন্যাসী বুহাইরার কাছ থেকে এই জ্ঞানগুলো আহরণ করার কোনো রকম অভিযোগ করেনি।

কী প্রমাণ করে এগুলো? এটাই প্রমাণ করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ কারও কাছ থেকেই এই জ্ঞানগুলো অর্জন করার সুযোগ পাননি।

এবার আসি দ্বিতীয় সিরিয়া যাত্রায়। ২৫ বছর বয়সে খাদীজার বাণিজ্যিক কাফেলার প্রধান হিসেবে মুহাম্মাদ ﷺ সিরিয়ায় ভ্রমণ করেন ব্যবসা করতে। মাসখানেকের এই যাত্রার বেশির ভাগই কেটে যায় যাওয়া ও আসার দীর্ঘ পথে। ইসলাম-বিদ্বেষীরা এই সিরিয়া যাত্রাকে কুরআনে বর্ণিত এতসব জটিল জ্ঞান, তত্ত্ব আর ঐতিহাসিক তথ্যের উৎস হিসেবে দাবি করে কোনো সুবিধা করতে পারে না ইতিহাসবিদদের কিছু ঐকমত্যের কারণে। কী সেগুলো?

এক. মুহাম্মাদ ﷺ সিরিয়ায় গিয়েই ব্যবসায়িক পণ্য বেচাকেনা শেষে খুব দ্রুত মক্কায়

[২৩] সীরাত ইবনু হিশাম, পৃষ্ঠা ১০-১২

ফিরে আসেন।

দুই. মুহাম্মাদের ﷺ সাথে উক্ত যাত্রায় এবং সিরিয়াতে কোথাও কোনো স্কলারের সাক্ষাৎ হয়নি।

তিন. বাণিজ্যিক কাফেলার দায়িত্বশীল প্রধান হিসেবে মুহাম্মাদের ﷺ পক্ষে এত কম সময় ও ব্যস্ততার মধ্যে কোনো স্কলারের সাথে দেখা করে কুরআনে বর্ণিত জটিল জ্ঞান, তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক তথ্যসমূহের জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব না।

অর্থাৎ, সঠিক ইতিহাস থেকে এটাই প্রমাণিত যে, নিজ গোত্রে, মক্কায়, এমনকি সিরিয়ার স্বল্পদৈর্ঘ্যের দুই বাণিজ্যিক যাত্রায় মুহাম্মাদের ﷺ কোনো শিক্ষক ছিল না।

মদীনায়?

প্রফেট হিসেবে ঘোষিত হবার পর নিজের জন্মভূমি মক্কায় অনবরত নির্মমভাবে অত্যাচারিত হতে থাকেন তিনি। হত্যা করা হয় তাঁর অনুসারী সাথিকে। হত্যার চেষ্টা চলে আরও কয়েকজন অনুসারীর ওপরেও, সাথে শারীরিক অত্যাচার তো আছেই। কিছু অনুসারী বাধ্য হয়ে তাই ছেড়ে যায় জন্মভূমি, আর পাড়ি জমায় আবিসিনিয়ার জমিনে। হামলা, ২ বছরেরও বেশি সময় জুড়ে নির্বাসন, অবর্ণনীয় শারীরিক-মানসিক অত্যাচার, আর হত্যার চেষ্টা চলে তাঁর ﷺ ওপরেও।

শেষে, প্রফেট এবং বার্তাবাহক হিসেবে ঘোষিত হবার ১৩ বছর পর মুহাম্মাদ ﷺ মদীনায় স্থানান্তরিত হন। জীবনের শেষ ১০ বছর তিনি মদীনাতেই কাটান। এই মদীনায় অনেকগুলো ইহুদি আর খ্রিষ্টান গোত্র ছিল। এবং তাদের গ্রন্থগুলোতে শেষ প্রফেটের নিদর্শনগুলোর ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকার কারণে এই ইহুদি-খ্রিষ্টানদের অনেকেই তাঁকে প্রফেট হিসেবে চিনে নেয়, মেনে নেয়। অহমিকা আর শঙ্কা ঝেড়ে ফেলে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে নেয় সত্যকে। সমর্পণ করে দেয় নিজেকে।

কিছু সমালোচকের দাবি শুনলে আপনি হেসে দিবেন। তারা বলে যে, জীবনের শেষ দশ বছরে যেহেতু মুহাম্মাদ ﷺ মদীনায় ছিলেন, অতএব ঐতিহাসিক তথ্যগুলো সব তিনি তাঁর ইহুদি-খ্রিষ্টান অনুসারীদের কাছ থেকেই নিয়েছেন। তো, এই দাবি শুনে আপনি হেসে দেবেন কেন?

কারণ :

অধিকাংশ ঐতিহাসিক ঘটনার নিখুঁত বর্ণনা এসেছে আগের ১৩ বছর জুড়ে মক্কায় বর্ণিত কুরআনেই। তাহলে, কীভাবে মদীনায় বসবাসকারী ইহুদি-খ্রিষ্টানেরা মুহাম্মাদকে ﷺ এই সব তথ্য শিখিয়ে দিয়েছে, উনার সাথে কখনো সাক্ষাৎ না করেই? হাসবেন না কেন, বলেন?

দ্বিতীয়ত, প্রায়ই মদীনার ইহুদি-খ্রিষ্টানেরা কুরআনের বর্ণনাকে বুঝতে ভুল করত। কীভাবে কিছু শেখানোর পরে, সেই শিক্ষাকেই ভুল বোঝা সম্ভব? অথবা, নিজেই যেটা জানি না, বুঝি না, সেটা কি অন্যকে বোঝানো, শেখানো সম্ভব? একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। আদী ইবনু হাতিম ﵁—যিনি পূর্বে একজন খ্রিষ্টান ছিলেন, তিনি বলেছেন :

'I went to the Prophet when he was reciting Surah Bara'ah (Surah no. 9), he then recited the "They have taken their scholars and monks as lords besides Allah." I told him after he finished, "We did not worship them,"

He replied, "Didn't they make some unlawful things which Allah had prescribed as lawful and then you followed them, and they made lawful things which Allah had prescribed as unlawful and then you followed them?"

I answered, "yes." The Prophet (saw) said, "This is the kind of worship they receive."'[২৪]

অর্থ :

'নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে আমি উপস্থিত হলাম। তখন তিনি সূরা বারাআত (সূরা তাওবা) তিলাওয়াত করছিলেন। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন,

"তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতদেরকে ও সংসার বিরাগীদেরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছে।" *[২৫]*

তাঁর তিলাওয়াত শেষ হওয়ার পর আমি তাঁকে বললাম, "আমরা তো তাদের ইবাদত করতাম না।"

তিনি বললেন, "তারা কি কিছু বিষয়কে হারাম বলে স্থির করত না—যা আল্লাহ হালাল করেছেন? আর তখন কি তোমরা তাদেরকে অনুসরণ করোনি? এবং তারা কি কিছু বিষয়কে হালাল বলে স্থির করত না—যা আল্লাহ হারাম করেছেন? আর তখন কি তোমরা তাদেরকে অনুসরণ করোনি?"

আমি উত্তরে বললাম, "হ্যাঁ।" নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "এটিই তাদের ইবাদত—যা তারা (তোমাদের কাছ থেকে) পেত।"'

[২৪] Tirmidhi 3095, Tabarani 218 and as-Sunan al-Kubra of Bayhaqi 20137
[২৫] সূরা তাওবা, ০৯ : ৩১

আরেকটু ইতিহাস বলি। ইহুদি-খ্রিষ্টান-সহ সকল অনুসারীরা সব মানুষের সাথে বসে মুহাম্মাদের ﷺ কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করতেন। প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নিতেন। উলটোটা ঘটত না। অর্থাৎ মক্কাতে তো বটেই, মদীনাতেও মুহাম্মাদই ﷺ ছিলেন শিক্ষক ও বক্তা, আর বাকিরা ছিলেন শ্রোতা ও শিক্ষার্থী। এই যখন ইতিহাসের অবস্থা, তখন উলটাপালটা দাবি শুনলে কি হাসি আসাটাই স্বাভাবিক না?

তার ওপর, মদীনায় আসার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নবিজির ﷺ জীবনে একের পর এক যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই ছিল। সাথে ছিল পুরো মদীনা দেখাশোনার দায়িত্ব। মুসলিমদেরকে শেখানোর দায়িত্ব। নিজের পরিবারের দেখাশোনা আর ভরণপোষণ তো আছেই। এর মাঝেই অমুসলিমদেরকে সত্যের পথে আহ্বান করার দায়িত্ব ছিল। এত শত কাজের ভিড়ে পড়াশোনা করার সুযোগ তো ছিলই না। ওপরন্তু, ইহুদি বা খ্রিষ্টান থেকে ইসলাম গ্রহণ করা কেউই তাঁর কাছের বন্ধু ছিল না যে, লুকিয়ে সাক্ষাৎ বা ব্যক্তিগতভাবে দেখা করা হবে। ইতিহাস থেকে এরকম একটা ঘটনার বর্ণনা তো দূরে থাকুক, ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না।

শুধু কি তা-ই? কুরআন যেভাবে, যে সুরে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে কথা বলেছে, তাতে কি কোনো ইহুদি বা খ্রিষ্টান মুহাম্মাদকে সাহায্য করার কথা? ভালোভাবে উপলব্ধির জন্য নিচের দুইটা আয়াতের কঠিন কথাগুলোই যে কারও জন্য যথেষ্ট হবে।

‘তারা অবশ্যই অস্বীকার করেছে (কুফরি করেছে), যারা বলে, “মারিয়ামপুত্র মাসীহই হচ্ছেন আল্লাহ।” মাসীহ তো বলেছিল, “হে বানী ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক।” যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অংশীস্থাপন করে, তার জন্য আল্লাহ অবশ্যই জান্নাত নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন; আর তার আবাস হচ্ছে জাহান্নাম। অন্যায়কারীদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।’[২৬]

‘বিশ্বাসীদের প্রতি মানুষের মধ্যে ইহুদি ও মুশরিকদেরকে নিশ্চয়ই তুমি সবচেয়ে বেশি শত্রুপরায়ণ দেখতে পাবে...’[২৭]

Professor David Thomas, an emeritus Professor of Christianity and Islam at the University of Birmingham, studied similar arguments cited here and the western approach in dealing with them and conclude :

---

[২৬] সূরা আল-মায়িদা, ৫ : ৭২

[২৭] আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৮২

'Precisely what Muhammad knew about Christianity and its teachings remains unclear. ... a Christian presence in the Hijaz and his native Mecca is less easy to identify. … It is the same with the Qur'an.

The fact that it has within it a great deal of detailed information about Christians, including monks and priests, and their beliefs about the Trinity, Incarnation and person of Jesus is undeniable.

And it seems just as clear that it assumes an advanced degree of knowledge of Abraham, Moses and other biblical figures, about whom it tends to comment rather than narrate, as though contributing to an ongoing conversation concerning the meaning and importance of their deeds and words.

But exactly how this relates to contemporary Christian beliefs, doctrines and teachings has long been the object of investigations that have so far not yielded much that lies beyond dispute.'[২৮]

"প্রফেসর ডেভিড থমাস বারমিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্রিষ্টবাদ ও ইসলাম বিষয়ের একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। এখানে আলোচ্য যুক্তিতর্ক এবং তাদের সাথে কথা বলা ও আচরণ করার ক্ষেত্রে তিনি পশ্চিমা পন্থার ওপর পড়াশোনা করেছেন এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন :

'খ্রিষ্টান ধর্ম এবং এর শিক্ষা সম্পর্কে মুহাম্মাদ আদৌ কিছু জানতেন কি না, তা বোঝা যায় না। ... হিজায অঞ্চলে এবং তার জন্মস্থান মক্কায় খ্রিষ্টানদের কোনোপ্রকার অস্তিত্ব কিংবা উপস্থিতি পাওয়া যায় না বললেই চলে। ... কুরআনের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে।

কুরআনে খ্রিষ্টান পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদের ব্যাপারে বিস্তারিত যেভাবে এসেছে, একইভাবে এই গ্রন্থে ত্রিত্ববাদ, অবতার ও যিশুর (ঈসা আ.) ব্যক্তিগত ব্যাপারে খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য থাকার বিষয়টিও কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

এবং এটি খুবই স্পষ্ট যে, এই কুরআন আব্রাহাম (ইবরাহীম আ.), মোসেস (মূসা আ.) ও বাইবেলে উল্লেখিত অন্যান্য চরিত্রের ব্যাপারে বাইবেলের চাইতেও অধিক পরিণত মাত্রার তথ্য প্রদান করে। এমনকি এই চরিত্রগুলোর কথা ও কাজের অর্থ

[২৮] (David Thomas et al (eds), Christian-Muslim Relations : A Bibliographical History, Volume 1 (600-900), LEIDEN, BOSTON (2009), pp. 2-3)

এবং গুরুত্বের ব্যাপারে জোর দেয়া নিয়ে আলোচনা চালু রাখার পাশাপাশি তাদের ব্যাপারে বর্ণনা করার চেয়ে বরং মন্তব্য করাতেই কুরআনের অধিক ঝোঁক দেখা যায়।

তবে আসলেই কীভাবে এটি সমসাময়িক খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস, মতবাদ ও শিক্ষার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে—তা সুদীর্ঘ সময় ধরে তদন্তের একটি বিষয় হয়ে আছে; এখন পর্যন্ত যা বাদানুবাদ ও বিতর্কের জায়গা ছাড়িয়ে অত প্রকাশিত হয়নি।'[২৯]

শুধু কি তা-ই? কপি-পেস্ট করা দূরে থাকুক, উলটো বাইবেল-তাওরাতে বর্ণিত ইতিহাসের সাথে কুরআনে বর্ণিত ইতিহাস প্রায়ই বিরোধপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করে। এরকম অনেকগুলো উদাহরণ আছে।

যেমন, বাইবেলে নবি ঈসা আলাইহিস সালামকে স্রষ্টার পুত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কুরআন সেটাকে নাকচ করে দিয়ে ঈসা আলাইহিস সালামকে কেবলমাত্র আল্লাহর বান্দা ও নবি হিসেবে ঘোষণা দেয়।

এছাড়াও, বিভিন্ন সময়ে আদম আলাইহিস সালাম, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, ইসহাক আলাইহিস সালাম, লূত আলাইহিস সালাম, দাউদ আলাইহিস সালাম-সহ বিভিন্ন নবিদের ঘটনা বর্ণনায় Judeo-Christian বর্ণনার সাথে কুরআন অসংখ্যবার মৌলিকভাবে সাংঘর্ষিক অবস্থান গ্রহণ করেছে, বর্ণনা করেছে। এগুলো একটা কথাই প্রমাণ করে যে, কুরআন কোনো ধরনের Judeo-Christian উৎস থেকে কপি করা হয়নি।

শুধু একটা ঘটনা বিস্তারিত বলি। আমরা অনেকেই মনে করি, মিশরের প্রধানকে সবসময়েই "**ফিরাউন**" উপাধিতে ডাকা হতো। বাইবেলও তাই বলে। আর তাই **ইউসুফ** 'আলাইহিস সালামের সময়কালীন মিশর আর **মুসা** 'আলাইহিস সালামের সময়ের মিশর, মিশরের এই দুই সময়ের শাসককেই বাইবেল "ফিরাউন" নামে আখ্যায়িত করে।[৩০]

আসুন, সরাসরি বাইবেলের সেই অংশগুলো পড়ে নিই একবার। আপনাদের সুবিধার জন্য প্রথমে ইংরেজীতে, এরপরে বাংলায় ওদেরই অনুবাদ তুলে দিচ্ছি। একইসাথে যে অংশগুলোতে খেয়াল করা দরকার, সেই শব্দগুলোকে গাঢ় করে দিচ্ছিঃ

"14 So Pharaoh (Firaun) sent for Joseph (Yusuf), and he was quickly brought from the dungeon. When he had shaved and changed his clothes, he came before Pharaoh (Firaun).

[২৯] ডেভিড থমাস, খ্রিষ্টান-মুসলিম সম্পর্ক : একটি বিবলিওগ্রাফিক্যাল ইতিহাস, ভলিউম ১ (৬০০-৯০০), লেইডেন, বোস্টন (২০০৯), পৃষ্ঠা নং ২-৩

[৩০] Bible, বাইবেল, জেনেসিস ৪১: ১৪, ২৫, ৪৬ – এর কয়েকটা উদাহরণ

15 Pharaoh (Firaun) said to Joseph (Yusuf), "I had a dream, and no one can interpret it. But I have heard it said of you that when you hear a dream you can interpret it."

16 "I cannot do it," Joseph (Yusuf) replied to Pharaoh (Firaun), "but God will give Pharaoh the answer he desires."" [৩১]

১৪ *"তাই* ***ফরৌণ (ফিরাউন) য়োষেফকে (ইউসুফকে)*** *ডেকে পাঠালে দুজন রক্ষী দ্রুত তাকে কারাগার থেকে বের করে আনল| **য়োষেফ (ইউসুফ)** দাড়ি কামালেন, পরিষ্কার জামা পরলেন| তারপর **ফরৌণের (ফিরাউনের)** সঙ্গে দেখা করতে গেলেন|*

১৫ ***ফরৌণ (ফিরাউন) য়োষেফকে (ইউসুফকে)*** *বললেন, "আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি কিন্তু কেউ তার ব্যাখ্যা করতে পারছে না| আমি শুনেছি য়ে তুমি স্বপ্ন শুনলে তার ব্যাখ্যা করতে পার|"*

১৬ উত্তরে ***য়োষেফ (ইউসুফ)*** *বললেন, "আমি পারি না! কিন্তু হয়তো* ***ফরৌণের (ফিরাউনের)*** *জন্য ঈশ্বর তার অর্থ বলে দেবেন|"* [৩২]

"25 Then Joseph (Yusuf) said to Pharaoh (Firaun), "The dreams of Pharaoh (Firaun) are one and the same. God has revealed to Pharaoh (Firaun) what he is about to do."[৩৩]

"২৫ তখন ***য়োষেফ (ইউসুফ) ফরৌণকে (ফিরাউনকে)*** *বললেন, "এই দুই স্বপ্নের বিষয়টা এক| ঈশ্বর শীঘ্রই যা করতে চলেছেন তা আপনার কাছে প্রকাশ করেছেন|"*[৩৪]

"46 Joseph (Yusuf) was thirty years old when he entered the service of Pharaoh (Firaun) king of Egypt. And Joseph (Yusuf) went out from Pharaoh's (Firaun's) presence and travelled throughout Egypt."[৩৫]

"৪৬ ***য়োষেফ (ইউসুফ)*** *৩০বছর বয়সে* ***মিশর-রাজ ফরৌণের (ফিরাউন)*** *সেবা করতে শুরু করলেন। পরে য়োষেফ (ইউসুফ) ফরৌণের (ফিরাউনের) কাছ থেকে বের হয় মিশর দেশের সবখানে ভ্রমণ করলেন।"*[৩৬]

---

[৩১] Genesis 41: 14-16, https://tinyurl.com/2d2hnr6t

[৩২] বাইবেল, আদিপুস্তক, ৪১ঃ১৪-১৬, https://bengali-bible.el-elupath-elu.in/1/Genesis/41/

[৩৩] Bible, Genesis, 41:25, https://tinyurl.com/msuw5spt

[৩৪] বাইবেল, আদিপুস্তক, ৪১ঃ২৫, https://bengali-bible.el-elupath-elu.in/1/Genesis/41/

[৩৫] Bible, Genesis, 41:46, https://tinyurl.com/5n7entw4

[৩৬] বাইবেল, আদিপুস্তক, ৪১ঃ৪৬, https://www.bible.com/bible/1681/GEN.41.BENGALI-BSI

আমরা দেখলাম যে, ইউসুফের ﷺ সমকালীন মিশরের শাসককে বাইবেল পরিষ্কার ভাষায় ফিরাউন হিসেবে উল্লেখ করেছে। এবার আসুন দেখা যাক, কুরআন কী বলে?

আমরা জানি, কুরআনের ১২ নং সূরার নাম সূরা ইউসুফ। এই সুরাতে ইউসুফের ﷺ পুরো ঘটনা কুরআন বর্ণণা করেছে। এই সূরায় আছেঃ

"And the king ('Malik' in Arabic) said, 'I saw in a dream…"[৩৭]

"রাজা (আরবীতে 'মালিক') বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম…"[৩৮]

"They said, 'We are missing the king's (Malik's) goblet..."[৩৯]

"তারা বলল, 'আমরা রাজার (মালিকের) পানপাত্র হারিয়েছি…"[৪০]

আমরা দেখলাম, এই ব্যাপারে কুরআন বাইবেলের তুলনায় একদম ভিন্ন এক অবস্থান নিয়েছে। উল্লেখ্য, কুরআনের অনেকগুলো অলৌকিকতার মাঝে এটি একটি। কুরআন যতবারই **ইউসুফ** 'আলাইহিস সালামের সমসাময়িক **মিশরপ্রধানের** আলোচনা করেছে,[৪১] ততবারই তাকে আরবীতে **'মালিক' (রাজা বা King)** হিসেবে আখ্যায়িত করেছে, ফিরাউন হিসেবে না।

শুধু তাই না, হাদীসেও একই ব্যাপার। সহিহ বুখারির ২২১৭ নং হাদীসে **ইবরাহীম** 'আলাইহিস সালামের **মিশরে** হিজরতের ঘটনা বলতে গিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিশরের শাসককে **'রাজা' (মালিক)** বলেছেন, ফিরাউন বলেননি।

কিন্তু এই একই কুরআন **মুসা** 'আলাইহিস সালামের সময়ের **মিশরের শাসককে** ঠিকই **'ফিরাউন'** হিসেবে সম্বোধন করেছে, 'মালিক' বা রাজা সম্বোধন করেনি।[৪২] চলুন, কুরআনের সেই ঐতিহাসিক মিরাকল নিজে পড়ে নিই, আর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাইঃ

"Then, after them, We sent Mūsā and Hārūn with Our signs to **Pharaoh (Firaun)** and his group, but they showed arrogance. And they were

---

[৩৭] Al-Qur'an, 12:43, https://qurano.com/en/12-yusuf/verse-43/
[৩৮] আল-কুরআন, সূরা ইবরাহিম, ১২ঃ৪৩, https://qurano.com/bn/12-yusuf/ayah-43/
[৩৯] Al-Qur'an, 12:72, https://qurano.com/en/12-yusuf/verse-72/
[৪০] আল-কুরআন, ১২ঃ৭২, https://qurano.com/bn/12-yusuf/ayah-72/
[৪১] আল-কুরআন, সুরা ইউসুফ, আয়াতঃ ৪৩, ৭২
[৪২] আল-কুরআন, সুরা আরাফ, আয়াতঃ ১০৪, সুরা ইউনুস, আয়াতঃ ৭৫

surely a guilty people."[৪৩]

"অতঃপর আমি তাদের পর মূসা ও হারূনকে আমার নিদর্শনাবলী সহ ফিরআউন ও তার পারিষদবর্গের নিকট পাঠালাম, কিন্তু তারা অহংকার করল, আর তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়।"[৪৪]

"Mūsā said, "O Pharaoh (Firaun), I am a messenger from the Lord of all the worlds;"[৪৫]

"মূসা বলল, 'হে ফিরআউন! আমি বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত রসূল।"[৪৬]

সুবহানাল্লাহ! নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে!

আমাদেরকে বুঝতে হবে, এই ছোট্ট পার্থক্যটার গুরুত্ব কিন্তু বিশাল! এই বিশালতা বুঝতে হলে একটু যে ইতিহাস জানতে হবে! জানতে হবে, **মুহাম্মাদের ﷺ সময়ে এই ইতিহাস ছিলো পুরোপুরি অজানা। কারণ, হায়ারোগ্লিফিক্স ভাষা থেকে এই ইতিহাস পুনরুদ্ধার করা হয়েছে অতি সম্প্রতি। সাড়ে ১৪০০ বছরেরও অনেক অনেক আগে থেকে সাম্প্রতিক সময়ের আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত এই ভাষা ছিলো সম্পূর্ণ মৃত এবং অপাঠ্য। অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ সহ সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত কেউই এই ইতিহাস জানতো না। জানা সম্ভবই ছিলো না।**

সম্প্রতি আবিষ্কৃত এই অবাক করা ইতিহাস আমাদেরকে জানাচ্ছে যে, **ইউসুফ** 'আলাইহিস সালামের সময় যারা **মিশর** শাসন করতো তারা ছিলো ভিনদেশী, অমিশরীয়। এই জাতির নাম ছিলো হিক্সস (Hyksos)।[৪৭] ১৭২০ খ্রীষ্টপূর্বে এরা মিশরের ক্ষমতায় আসে। এই শাসকদের উপাধি ছিলো **'মালিক' তথা রাজা।**

১৫৬০ খ্রীষ্টপূর্বের দিকে মিশরীয়রা এই ভিনদেশী হিক্সস জাতিকে দূর করে দেয়, দখল করে ক্ষমতা। এই সময়টা **'নিউ কিংডম' এর প্রারম্ভকাল হিসেবে প্রাচীন মিশরের ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত ইতিহাস আমাদেরকে বলছে যে, ১৫৬০ খ্রীষ্টপূর্বে 'নিউ কিংডম' এর শুরু হওয়ার পর থেকেই মিশরের শাসকেরা 'ফিরাউন' উপাধি গ্রহণ করে, এর আগে না।**

---

[৪৩] Al-Qur'an, 10:75, https://qurano.com/en/10-yunus/verse-75/
[৪৪] আল-কুরআন, ১০ : ৭৫, https://qurano.com/bn/10-yunus/ayah-75/
[৪৫] Al-Qur;an, ৭:১০৪, https://qurano.com/en/7-al-a-raf/verse-104/
[৪৬] আল-কুরআন, ৭ : ১০৪, https://qurano.com/bn/7-al-a-raf/ayah-104/
[৪৭] 'Egypt' in H. Lockyer, Sr. (General Editor), F.F. Bruce et al., (Consulting Editors), Nelson's Illustrated Bible Dictionary, 1986, Thomas Nelson Publishers, p. 324.

মজার ব্যাপার হচ্ছে, উপরে আমরা নিজেরাই পড়ে দেখেছি, Judeo-Christian উৎসগুলো শাসকের এই ভিন্ন উপাধির মাঝে কোন পার্থক্য করতে পারেনি, কিন্তু কুরআন করেছে। অর্থাৎ কুরআন শুধু বিরোধপূর্ণ অবস্থানই নেয়নি, বরং নিখুঁত ও সঠিকভাবে ইতিহাসকে বর্ণণা করেছে, যেটা শিক্ষাবিহীন, অনক্ষর মুহাম্মাদের ﷺ পক্ষে অসম্ভব তো বটেই, এমনকি সেই সময়ের কোন মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে জ্ঞানার্জন করেও সঠিকভাবে বর্ণণা করা সম্ভব ছিলো না।

এই অলৌকিকতার ব্যাখ্যা তো শুধু একটাই আছে, তাই না?

অতএব, উপসংহারটা কি আলাদা করে বলে দেয়ার কোন দরকার আছে?